XXBE
বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
৯৩ বর্ষ ৭৮ সংখ্যা মঙ্গলবার ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ কলকাতা

দ্রুত, দায়বদ্ধ শাসন

ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ ছিল, এই সরকার নীতিপঙ্গুত্বে ভুগিতেছে, ইহার সিদ্ধান্তগ্রহণের এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার তৎপরতা নাই। ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী প্রচারে এই অভিযোগ স্বভাবতই বহুশ্রুত ছিল। ক্ষমতাসীন হইবার পরে প্রথম এক সপ্তাহে নরেন্দ্র মোদী স্থবিরতা হইতে তৎপরতায় উত্তরণের কিছু প্রাথমিক সংকেত দিয়াছেন। 'মন্ত্রিগোষ্ঠী' রদ করিবার সিদ্ধান্তটি সেই তালিকায় অগ্রগণ্য। মনমোহন সিংহের সরকার মোট ২১টি 'মন্ত্রিগোষ্ঠী' এবং ৯টি 'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রিগোষ্ঠী' তৈয়ার করিয়াছিল। ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল, যে সকল প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে একাধিক মন্ত্রকের অনুমোদন দরকার, সেই সব বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াটিকে সুসমন্বিত এবং ত্বরান্বিত করা। বাস্তবে বিপরীত ফলই ফলিত। প্রায় কোনও বিষয়েই সরকার কোনও সিদ্ধান্ত লইয়া উঠিতে পারিত না। নরেন্দ্র মোদীর সরকার এক ধাক্কায় ওই সব মন্ত্রিগোষ্ঠী বাতিল করিয়া এক ঢিলে দুইটি পাখি মারিতে চাহিয়াছে। এক, প্রত্যেক মন্ত্রীর দায়বদ্ধতা বাড়ানো এবং দুই, দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

ইউপিএ আমলের মন্ত্রিগোষ্ঠীর বাস্তব অপকারিতা বুঝিবার জন্য কয়েকটি পরিসংখ্যান যথেষ্ট। এক মন্ত্রীর আপত্তিতে ক্রমাগত অন্য মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত বানচাল হইতে থাকে। শিল্প বা খনি মন্ত্রকের সহিত পরিবেশ মন্ত্রকের বোঝাপড়ার সমস্যারও মীমাংসা হয় না। বরিষ্ঠ মন্ত্রীরা সময় দিতে না পারায় কোনও কোনও মন্ত্রিগোষ্ঠী দুই বছরে এক বারও বৈঠকে বসিতে পারে নাই। প্রসার ভারতী বিষয়ক মন্ত্রিগোষ্ঠী ২০১১ জুনের পর আর বৈঠক করে নাই। নদী সংযুক্তি কিংবা অমৃতসর কলিকাতা 'ফ্রেট-করিডর'-এর মতো বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য গঠিত মন্ত্রিগোষ্ঠী এক বারও বৈঠক করে নাই। যে-সিদ্ধান্ত একক ভাবে এক জন মন্ত্রীর লওয়া উচিত, অন্য মন্ত্রকের সহিত বিরোধ বা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে যাহাতে প্রধানমন্ত্রীর নিজের হস্তক্ষেপ করা উচিত, তাহা মন্ত্রিগোষ্ঠীর বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে এক দিকে ব্যক্তি-মন্ত্রীদের দায় এড়াইবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, অন্য দিকে প্রশাসন দীর্ঘসূত্রী হয়। প্রশ্ন ওঠে, তবে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার প্রয়োজন বা গুরুত্ব কী রহিল? প্রধানমন্ত্রীর এক্তিয়ারেরই বা কী হইল? নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রশাসনে এই অসামঞ্জস্য ঘুচাইতে তৎপর হইয়াছে।

মন্ত্রকের প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মকে 'মন্ত্রিগোষ্ঠী'র হাতে ন্যস্ত করা বা তাহার উপরে 'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রিগোষ্ঠী' চাপাইয়া দিবার মধ্যে এক ধরনের মানসিক ব্রাহ্মণ্যবাদের ঔপচারিকতা ও আচারসর্বস্বতার প্রভাব আছে। কোনও কাজ সুষ্ঠু ভাবে করিতে হইলে কর্তাকে কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হইবে। কাজটি দক্ষিণ হস্তে করা হইতেছে, না বাম হস্তে, ডান পার্শ্বে কাত হইয়া নাকি বাম পার্শ্বে, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া নাকি গোবরের তিলক আঁকিয়া, ইত্যাকার খুঁটিনাটি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হওয়া অর্থহীন, হাস্যকর। মানসিকতার এই সমস্যাই মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠনের মূলে। কাজ করার জন্য কাজ করার সদিচ্ছাই যথেষ্ট। কাজের বাধা দূর করিতে নিশ্চয় উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা হস্তক্ষেপও কখনও কখনও জরুরি হইতে পারে। কিন্তু পদে পদে কাজের সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, সমন্বয় বা যৌথ দায়িত্বের নামে নির্দিষ্ট কোনও এক জন কর্তাকে তাঁহার কর্মের জন্য দায়বদ্ধ না-করার রীতি বিভ্রান্তিকর। অধিকাংশ মন্ত্রকের কাজকর্ম এখন খুব জটিল এবং একক কোনও মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল নয়-- ইউপিএ-র এমন যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এই যুক্তিতে ক্যাবিনেটের কর্তৃত্ব এবং সরকারি প্রশাসনের সচলতা, উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্ত স্বাগত।

অর্থনীতির পথ

অভীষ্ট জয়লাভ হইয়াছে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও প্রশ্নাতীত। অতঃপর আশা করা চলে, নরেন্দ্র মোদী তাঁহার প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তবায়নে কালক্ষেপ করিবেন না। আসমুদ্রহিমাচল যাহার আশায় তাঁহার ঝুলি ভরিয়া দিয়াছে, তাহার নাম অর্থনীতির পুনরুত্থান। তাহার দুইটি পথ। প্রথম, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া মানুষকে কিঞ্চিৎ স্বস্তি দেওয়া; এবং দ্বিতীয়, ভারতকে ফের চড়া বৃদ্ধির হারের কক্ষপথে ফিরাইয়া আনা। ক্ষমতায় আসিলেই এই দুইটি কাজ সারিয়া ফেলিব, এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যতখানি সহজ, প্রকৃত কাজটি তাহার বহু গুণ দুষ্কর। ভারতে মূল্যস্ফীতি যতখানি চাহিদাতাড়িত, তাহার তুলনায় অনেক বেশি জোগানের অভাবের ফলে। বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে। নরেন্দ্র মোদীর হাতেও কোনও জাদুদণ্ড নাই যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়াই মূল্যস্ফীতির রাক্ষসকে দেশছাড়া করিবেন। আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সমস্যা গভীর। ইউপিএ সরকার তাঁহাকে যে অর্থনীতির উত্তরাধিকার দিয়াছে, তাহা পোকায় কাটা। সাম্প্রতিকতম তথ্য বলিতেছে, গত অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থনীতি প্রত্যাশিত ৪.৯ শতাংশ হারেও বাড়ে নাই। হারটি ৪.৭ শতাংশ। সেই বৃদ্ধিরও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে। মৌসম ভবন এই বৎসর অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টির পূর্বাভাস করিয়াই রাখিয়াছে। কাজেই, বৃদ্ধির হারের উন্নতির কাজটিও সহজ নহে। তবে বিনিয়োগকারীরা যে মোদীর উপর ভরসা রাখিয়াছেন, তাহা গত তিন সপ্তাহে স্পষ্ট হইয়াছে। ভারতে বিদেশি বিনিয়োগের ঢল নামিয়াছে। এই ভরসাটি ধরিয়া রাখিতে পারিলে তাঁহার চিন্তার একাংশ অন্তত কমিবে।

ভরসা ধরিয়া রাখার একমাত্র উপায়, অর্থনীতির রোগ সারাইতে নিজের সদিচ্ছার প্রমাণ দেওয়া। প্রধান কর্তব্য, রাজকোষের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার। ইউপিএ সরকার জনপ্রিয়তা অর্জনের খেলায় মাতিয়া যে ভর্তুকি-রাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা বিলোপ করিতে হইবে। নরেন্দ্র মোদী 'গরিবের জন্য বাঁচিবার' যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহাকে ভর্তুকি বিতরণের চেনা পথে টানিয়া লইয়া না যায়। ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে বহু উন্নয়ন প্রয়োজন। কিন্তু তাহার জন্য সামাজিক পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করিতে হইবে— বিনা পরিশ্রমে কিছু টাকার ব্যবস্থা করিয়া সেই উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। পেট্রোলিয়াম বা রান্নার গ্যাসের ন্যায় ক্ষেত্রে নির্মম ভাবে ভর্তুকি ছাঁটিতে হইবে। অন্য দিকে কর আদায়ের পথটিও স্বচ্ছ এবং সাবলীল করা বিধেয়। তিনি পণ্য ও পরিষেবা করের বকেয়া প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কর বিধির কাজটিও যাহাতে অগ্রসর হয়, সে দিকে নজর রাখিতে হইবে। রাজকোষ তাঁহার নিয়ন্ত্রণে আসিলে তিনি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন। উন্নততর পরিকাঠামো ব্যতীত যে আর্থিক উন্নতি সম্ভব নহে, কথাটি নরেন্দ্র মোদী বিলক্ষণ জানেন। এবং, পরিকাঠামো খাতে আপাতত সরকারকেই বিনিয়োগ করিতে হইবে। রাজকোষ ঘাটতিতে রাশ টানিতে পারিলে নরেন্দ্র মোদী তাঁহার জোড়া সমস্যারও বহুলাংশে সমাধান করিতে পারিবেন। রাজকোষ ঘাটতির সহিত মূল্যস্ফীতির সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। বাজারে অতিরিক্ত টাকার জোগান কমিলে মূল্যস্ফীতি খানিক কমিবে বইকী। অন্য দিকে, সরকার আর্থিক শৃঙ্খলাকে গুরুত্ব দিলে বিনিয়োগকারীদের নিকট তাহা ইতিবাচক বার্তা বহন করিবে। ইউপিএ সরকার আর্থিক বিশৃঙ্খলাতেই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল। মোদী সেই ভুল শুধরাইতে পারিবেন কি?

অর্থনীতির চশমায় দুনিয়া দেখেছিলেন

মৈত্রীশ ঘটক

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকার (২ ডিসেম্বর ১৯৩০–৩ মে ২০১৪) বাজার অর্থনীতির সূত্র ধরে বৈষম্য থেকে অপরাধ, বিয়ে, ব্যাখ্যা খুঁজেছিলেন অনেক কিছুর।

বাঙালি বামপন্থার শ্যামল তরুছায়ায় বড় হয়ে, গবেষণার ছাত্র হিসেবে আমেরিকার পূর্ব-উপকূলের উদারপন্থী ভাবধারার সঙ্গে হালকা আলাপ পরিচয়ের পরে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উগ্র মুক্ত-বাজারপন্থী অর্থনীতি বিভাগে অনুজ অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়ে মনে হল, এ কোন গ্রহে এসে পড়েছি! এক সহকর্মী প্রশ্ন তুললেন, কেউ স্বেচ্ছায় ক্রীতদাস হিসেবে নিজেকে বিক্রয় করতে চাইলে, তাকে আটকাবার আমাদের কী অধিকার আছে? আবার কেউ বললেন, ঘুষ অতি উত্তম জিনিস। সরকারি নিয়মকানুনই হল যত সমস্যার মূলে, আর বাজার যেমন মূল্যের ওঠাপড়া দিয়ে সম্পদের দক্ষ বণ্টন করে, ঘুষও তাই করে। আর এক জন বললেন যে মাদকদ্রব্য, বন্দুক, মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (যেমন কিডনি) এগুলো অবাধে কেনাবেচা আইনি করে দেওয়া উচিত। বন্দুক অবাধে কেনাবেচা হলে নাকি অপরাধ এবং খুনজখম কমবে, কারণ সাধারণ নাগরিকরাও পকেটে বা ব্যাগে বন্দুক নিয়ে ঘুরবেন, অপরাধীরা বেশি সুবিধা করতে পারবে না!

এই ধরনের অনেক চিন্তা এবং যুক্তির ঠিকানা খুঁজলে রাস্তা এসে শেষ হবে যাঁর অফিসের দোরগোড়ায়, তিনি হলেন অর্থনীতির শিকাগো ঘরানার এক প্রবাদপুরুষ, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকার। গত ৩ মে ৮৩ বছর বয়েসে তিনি মারা গেলেন।

বর্ণবৈষম্য, আত্মহত্যা, নেশা, অপরাধ, এবং দুর্নীতি, এই সব সামাজিক সমস্যা কি মূলধারার অর্থনৈতিক চর্চার বিষয় হতে পারে? বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা, সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক এই সব বিষয়ে অর্থনীতির কি কিছু বলার থাকতে পারে? অর্থনীতির দুনিয়ায় এখানেই গ্যারি বেকারের অপরিসীম গুরুত্ব। অনেক সমালোচনা ও উপহাস উপেক্ষা করে তিনি একের পর এক অর্থনীতির সঙ্গে আপাত-সংযোগহীন বিষয়কে টেনে এনেছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কাঠামোর মধ্যে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে হবে, অর্থনীতির তত্ত্বের আলোয় বিশেষ কোনও অন্তর্দৃষ্টি লাভ হল না। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে হবে দস্যু মোহনের গল্পের মত, 'কোথা হইতে কি হইয়া গেল, মোহনের হাতে পিস্তল'— শেষ পর্যন্ত মুক্ত বাজারই জয়ী। বেকারের কাজে বাজার অর্থনীতির প্রতি এই ধরনের একটা পক্ষপাত অবশ্যই আছে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও মূলধারার অর্থনীতির যুক্তির সূক্ষ্ম এবং সৃষ্টিশীল প্রয়োগে বেকার অতুলনীয়। ব্যক্তিগত মতামত ছেড়ে অর্থনীতির গবেষণার জগতে যেটাকে বিষয়ের ওপর প্রভাবের নৈর্ব্যক্তিক মাপকাঠি বলে ধরা হয়, অর্থাৎ অন্য গবেষকদের লেখায় উল্লেখের সংখ্যা, সেই মাপকাঠি বলবে, বেকারের সর্বাধিক উল্লিখিত গবেষণা হল মানবিক মূলধন (human capital) নিয়ে ১৯৬৪ সালে লেখা তাঁর বই। গুগল স্কলারে এর উল্লেখ প্রায় ২৪,০০০। আধুনিক মূলধারার অর্থনীতির দিকপাল জন মেনার্ড কেইন্স, পল সামুয়েলসেন, কেনেথ অ্যারো, বা মিলটন ফ্রিডম্যান এঁদের কারও কোনও একক বই বা গবেষণাপত্রের এত উল্লেখ নেই।

অর্থনীতি-শাস্ত্রের মূল তিনটি যুক্তিকে বিভিন্ন ও বিচিত্র অর্থনৈতিক-সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণ করতে ব্যবহার করেছেন বেকার। প্রথমত, মানুষ খামখেয়ালি নয়, সে যে কোনও পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয় কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যেমন ব্যবসায়ীর লক্ষ্য হল সর্বাধিক লাভ অর্জন করা। দ্বিতীয়, এই সিদ্ধান্তগুলো বিভিন্ন জিনিসের দাম, মানুষের আয় ও সম্পদের ওপর নির্ভর করে। তৃতীয়ত, ট্রাফিক লাইট যেমন যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সে রকম বাজারের শক্তি অজস্র মানুষের অগণিত সিদ্ধান্তের মধ্যে ভারসাম্য আনে দামের ও নানা পেশায় আয়ের ওঠা-নামার মাধ্যমে। এই কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বেকারের অর্থনীতির প্রণালী সীমানা পেরিয়ে অভিযানের কতগুলো উদাহরণ দিই।

১৯৫৫ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বেকার যে বিষয় নিয়ে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি করেন, তা হল বৈষম্যের অর্থনীতি। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি সমস্ত ক্ষেত্রে আমেরিকায় তখন কৃষ্ণাঙ্গরা আক্ষরিক অর্থে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, নানান বাধা-নিষেধ এবং বৈষম্যের শিকার। বেকার প্রশ্ন তুললেন অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৈষম্য কী? ধরুন, একটা চাকরির জন্য দু'জন প্রার্থীর যোগ্যতা একেবারে এক। কিন্তু, আপনি কোনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে এক জনকে নিলেন না, অন্য জনকে নিলেন। চাকরির বাজারে যদি প্রার্থীর অভাব না থাকে, তবে চাকরিদাতার কোনও সমস্যা নেই, ব্যক্তিগত অপছন্দের ভিত্তিতে কাউকে না নিলেও তাঁর চলবে। কিন্তু, বাজারে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যদি সীমিত হয়? সেই অবস্থাতেও কেউ চাইলে বৈষম্য করতেই পারেন, কিন্তু নিখরচায় নয়। এই 'বিলাসিতা' করতে গেলে লাভ কমে যাওয়া মেনে নিতে হবে, কারণ তিনি গায়ের রং বা ধর্ম বা (চাকরির ক্ষেত্রে) অন্য কোনও অপ্রাসঙ্গিক কারণে যাঁকে নিলেন না, তার জায়গায় তুলনায় অল্প যোগ্যতার কাউকে নিয়োগ করলেন। বেকারের যুক্তি হল, বাজারে অন্য যে নিয়োগকর্তারা শুধু লাভ-লোকসান দেখেন, তাঁরা এই যোগ্য কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের কম মজুরিতে নিয়োগ করবেন এবং এঁদের প্রতিযোগিতার চাপে শেষে বৈষম্যকারী নিয়োগকর্তাদেরই বাজার ছেড়ে চলে যেতে হবে। যে দোকানদাররা কৃষ্ণাঙ্গদের পণ্য বেচতে অস্বীকার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ঘটনাটাই ঘটবে। মানতেই হবে বৈষম্য বিষয়টির অনেক দিক, অনেক জটিলতা আছে, এবং বেকারের গল্পটি খানিকটা অতিসরলীকৃত। কিন্তু আর্থিক ভাবে কুশলী নয়, এমন যে কোনও অভ্যাস বা সামাজিক রীতিকে (তা সে ভাল হোক বা মন্দ) বাজারের শক্তি কী ভাবে ক্ষইয়ে দিতে পারে, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোই এই তত্ত্বের বৃহত্তম অবদান।

বৈষম্যের ক্ষেত্রে যদি অর্থনীতির যুক্তি প্রয়োগ করা যায়, বিয়ের বাজারেই বা নয় কেন? ধরা যাক বিবাহযোগ্য সমস্ত ছেলে এবং মেয়েকে তাদের মেধা, শিক্ষা, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থান, সৌন্দর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে ফেলা হল। বেকার বলেছেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল বিপরীত লিঙ্গের সবচেয়ে আকর্ষক মানুষটিকে বিয়ে করতে চাওয়া। কিন্তু চাইলেই তো আর হয় না, এই প্রতিযোগিতায় সাধারণত সমানে সমানেই বিয়ে হয়। পরিভাষায় একে বলে অ্যাসর্টেটিভ ম্যাচিং বা সমতুল্য সমন্বয়। ফলে, পরিবার তৈরি হওয়ার সময়েই এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের বৈষম্যও তৈরি হয়ে যায়। বংশগতির প্রভাব যদি বাদও দিই, মা-বাবা উচ্চশিক্ষিত হলে সন্তানও শিক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা যে বেশি, সেটা অস্বীকার করবে কে? উচ্চশিক্ষিত সন্তান পরে বিয়ের বাজারে গেলে তার সমযোগ্য সঙ্গীই পাবে এবং পরবর্তী প্রজন্মও তার সুফল পাবে। বেকার বলেছেন, এ এমনই এক অনিবার্য অসাম্য, বিত্তের বা আয়ের কোনও পুনর্বণ্টনেই যাকে দূর করার জো নেই।

শুধু গবেষণা নয়, বেকার নিয়মিত সংবাদপত্রে প্রবন্ধও লিখতেন। মুক্ত বাজারের প্রতি ঝোঁক অবধি ঠিক ছিল, কিন্তু চিলের একনায়ক পিনোশে-র বাজারমুখী সংস্কারের সমর্থনে এবং তাতে শিকাগো ঘরানার অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা নিয়ে ওঁর একটি লেখা পড়ে মনে আছে বেশ হতাশ হয়েছিলাম। প্রশ্ন জেগেছিল, প্রকৃত উদারবাদী হলে রাষ্ট্রের দমনপীড়ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন কী করে থাকা যায়? তবে, উদ্দেশ্য মনোমত হলে যে কোনও পন্থাই সমর্থনীয়, এই মনোভাব বাজারপন্থীদের একচেটিয়া নয়, বাম বা দক্ষিণ দুই তরফেই তার উদাহরণ প্রচুর।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক মতাদর্শকে শেষ বিচারে আলাদা করা যায় না। মুক্ত বাজারের যুক্তির অবাধ প্রয়োগ তো শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনাসভায় বুদ্ধিচর্চায় সীমিত থাকে না। মতাদর্শ হিসেবে বাস্তব পৃথিবীতে তার পরিণামের কথা ভুলে গেলে চলবে না। সেই বিতর্ক আবশ্যক। কিন্তু রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত বিরোধ সরিয়ে রেখে চিন্তার জগতে উৎকর্ষের কদর করা শুধু সৌজন্যের খাতিরে নয়, প্রতিপক্ষের শ্রেষ্ঠ যুক্তিগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করে নিজের চিন্তার বিকাশের জন্যেও প্রয়োজনীয়। তাই রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে নিখাদ অর্থনীতির যুক্তির অভিনব প্রয়োগে বেকারের সৃষ্টিশীল কাজ থেকে অর্থনীতিবিদদের অনেক কিছু শেখার আছে বলে মনে হয়। এই সৃষ্টিশীলতার একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। কোনও এক দিন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে অর্থনৈতিক অনটনের সমস্যার যদি সমাধান হয়ে যায়, সেই 'সব পেয়েছির দেশ'-এ কি কোনও অভাব থাকবে না? অর্থশাস্ত্র অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে? গ্যারি বেকার বলেছেন, সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তু হল সময়, আর সব পেয়েছির দেশেও, দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই থাকবে, আর আমরা নশ্বরই থাকব। তার ওপর প্রাচুর্যের কারণে আমাদের সামনে এত বিকল্প থাকবে, যে সময়ের দাম আকাশছোঁয়া হবে। অর্থাৎ, মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত আছে এই মৌলিক দ্বন্দ্ব! এই উপলব্ধির মধ্যে কোথাও যেন দর্শন বা একটু কবিতারও ছোঁয়া আছে। অর্থনীতি শাস্ত্রকে আয়-ব্যয়-সঞ্চয় মুদ্রা-মূল্য-মন্দা এ সবের পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে নতুন নতুন দিগন্তে বিস্তার করে দেবার জন্যে তাই গ্যারি বেকারের অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অর্থনীতিবিদেরা ভুলতে পারবেন না, যতই মহার্ঘ হোক তাঁদের সময়।

বেকার-এর কাজে বাজার অর্থনীতির প্রতি এই ধরনের একটা পক্ষপাত অবশ্যই আছে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও মূলধারার অর্থনীতির যুক্তির সূক্ষ্ম এবং সৃষ্টিশীল প্রয়োগে বেকার অতুলনীয়।

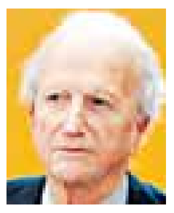

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির শিক্ষক

বাড়িতে শৌচালয় থাকলে ওরা বেঁচে যেত

শাশ্বতী ঘোষ

ভারতে বহু মেয়ে লাঞ্ছিত, ধর্ষিত, এমনকী নিহত হয় কেবল বাড়িতে শৌচাগারের অভাবে বাইরে যেতে হয় বলে। শৌচাগারের অধিকার তাই দরিদ্র মেয়েদের জীবনের অধিকারের শামিল।

মহিলা
সুরক্ষা?
স্বাভিমান
বদায়ু কাণ্ড

উত্তরপ্রদেশের বদায়ূঁতে হতভাগ্য দলিত মেয়ে দুটির আর্তনাদ শুনে নিম্নবর্ণের মরিয়া গোষ্ঠীর কাকা দেখেছিলেন, যাদবদের ছেলে পাপ্পু এক জনের চুল ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি পুলিশকে জানালে পুলিশকর্মী বলে, দু'ঘণ্টা পরে না ফিরলে খোঁজ নেবে। মরিয়া গোষ্ঠীর অভিযোগ, যাদব পুলিশ যাদবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেয়নি। উত্তরপ্রদেশে এখন যাদব রাজ।

জাতপাত আর পৈশাচিকতার এই কাহিনির একটি অন্য মাত্রাও আছে। বদায়ূঁর দুই কিশোরীকে হয়তো এ ভাবে ধর্ষিত হয়ে, গাছে ঝুলে নিহত হতে হত না, যদি তাদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই একটি শৌচাগার থাকত। হরিয়ানার ভাগানার চারটি মেয়েকেও ধর্ষিত হয়ে ভাতিন্ডা রেল স্টেশনে শব হয়ে পৌঁছতে হত না। সিঙ্গুরের শহিদ অভিধা নিয়ে কৈশোরেই চলে যেতে হত না তাপসী মালিককে। খরজুনার গৃহবধূটিও বেঁচে থাকতেন। বিহারের অনগ্রসর শ্রেণির জন্য নিযুক্ত পুলিশের আই জি অরবিন্দ পাণ্ডে বিবিসি'কে জানিয়েছেন, ২০১২ সালে রাজ্যে ধর্ষিত ৮৮৩ জন অনগ্রসর শ্রেণির মেয়ের মধ্যে ৪০০ জন বেঁচে যেত শৌচাগারের সুযোগ থাকলে।

এ কোনও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ২০১১ সালেও ৫৩ শতাংশ ভারতীয় বাইরে শৌচকার্য সম্পন্ন করতে বাধ্য হন। এগুলি তো গড়, তার মধ্যে গ্রাম-শহরে, নিম্নবিত্ত-উচ্চবিত্তে আর নারী-পুরুষে হয়ে যায় বিরাট ফারাক। গ্রামে বা শহরের নিম্নবিত্ত এলাকায় প্রায় ৭০ শতাংশ বাড়িতে শৌচাগার নেই। কিন্তু দেশে মোবাইলে যোগ রয়েছে এ রকম মানুষ ৮০ শতাংশ। শহুরে পুরুষরা তাও হয়তো শৌচাগার পান, মেয়েদের অবস্থা ভয়াবহ। মেয়েরা আঁধার নামলে বা আলো ফোটার আগে একলা বা দল বেঁধে শৌচ সারেন, ঝোপঝাড়ের আড়ালে, ফসলের খেতে, হাইওয়ের ঢালে। পুরুষমানুষরা তক্কে তক্কে থাকে, উঁকিঝুঁকি, শিস দেওয়া, টর্চ ফেলা, উলঙ্গ হয়ে পুরুষাঙ্গ দেখানো, 'কী করতে এসেছিস?' প্রশ্ন করা বা অশালীন মন্তব্য করা তো নিরীহ ব্যাপার, টেনে নিয়ে যাওয়া, গায়ে হাত দেওয়া, এমনকী ধর্ষণ পর্যন্ত ঘটে। গ্রামে কারও বাগানে ঢুকলে লাঞ্ছনা অবধারিত। বর্ষায় জলে-ডোবা খেত আর সাপে কাটার ভয়। এই মেয়েদের পক্ষে শৌচকার্য রীতিমতো পরিকল্পনার বিষয়। জল আনতে গেলেও হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিতে হয়, কিন্তু তার মধ্যে লজ্জা নেই; ঝগড়াঝাঁটি আছে, কিন্তু পুরুষের অশালীন আক্রমণের আশঙ্কা নেই।

দিল্লির ১২টি পুরসভায় পুরুষদের জন্য ৩৭১২টি আর মেয়েদের জন্য ৩৫০০টি শৌচালয় আছে। এর মধ্যে অনেকগুলি বাণিজ্যিক এলাকায়, ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা নয়। কলকাতার পরিসংখ্যান পাইনি। তবে এটুকু জানি, পুরুষরা যেখানে-সেখানে নিজেদের হালকা করতে দাঁড়িয়ে যায়। শৌচালয়গুলিতে টাকা দিতে হয়। যে মেয়ের রোজকার মজুরি ৩০ টাকা, তাঁকে ৫ টাকা খরচ করতে হলে ভাবতে হবে বইকী। সেই সব জনশৌচালয়েও বিব্রত করে কৌতূহলী পুরুষের অশালীন আচরণ। অনেক সময় এগুলির আলো খারাপ থাকে, জানালা নিচু, ফলে উঁকিঝুঁকির সুবিধে। দিল্লির কেন্দ্র থেকে উচ্ছেদ হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে পুনর্বাসিত দুটি বস্তি বালসাওয়া আর বায়ানা কলোনিতে সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, পুনর্বাসনের সময় সরকার টয়লেট কমপ্লেক্স বানিয়ে দিয়েছিল, এখন শৌচালয় পিছু ৩০০ জন ব্যবহারকারী। লাইনের দৈর্ঘ্য বোঝাই যায়। অনেক সময় সেগুলির ছাদ উড়ে যায়, নেশাখোররা ঘোরাঘুরি করে। আর মাসের মধ্যে এক বার অন্তত একটি মেয়েকে, বিশেষত কিশোরী মেয়েকে তুলে নিয়ে যায় রাজমিস্ত্রিরা, বাড়ির লোকেরা পুলিশকে কী করে বলবে যে শৌচকার্য করতে তাকে বাইরে যেতে হয়? নামহীন নির্যাতিতার নিগ্রহ পরিবারের সম্মানের তলায় চাপা পড়ে থাকে। তাই মেয়েরা তিন-চার জন মিলে যান, হাতে থাকে জলের বোতল, যাতে কেউ হাত বাড়ালে অন্তত দু'ঘা লাগিয়ে দেওয়া যায়। শুধু দিল্লি নয়, অন্যত্র, যেমন ধারাভিতেও যৌনহেনস্থা এড়াতে দল বেঁধেই শৌচালয়ে যেতে হয়। ছবিটা হয়তো সব শহর আধাশহরেই সত্যি।

তবু এরই মধ্যে দু'একটা রুপোলি রেখা আছে। হরিয়ানায় 'বাড়িতে শৌচালয় নেই তো বউ আসবে না' প্রচার বেশ সফল। প্রতিবাদী প্রিয়ঙ্কা ভারতীর 'শৌচালয় নেই তো বিয়ে নয়' দাবিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর ইউনিসেফ গ্রহণ করেছে। 'নির্মল গ্রাম' মানে কেউ বাইরে শৌচ করে না— জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিদ্যা বালন হয়েছেন সেই প্রচারের মুখ। যে উত্তরপ্রদেশে বদায়ূঁর ঘটনা ঘটে, সেখানেই লখনউয়ের কাছে আহমেদপুরে মেয়েদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী সরকারি প্রকল্প আর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় গড়ে তুলেছে একটি টয়লেট কমপ্লেক্স, যার জমিটি দিয়েছেন স্থানীয় এক কৃষক। চারটি শৌচাগার আর দুটি স্নানাগার, নারী ও পুরুষদের পৃথক অংশ, পৃথক প্রবেশদ্বার। গ্রামে একটি গণশৌচালয় কমিটি তৈরি হয়েছে, পরিবার পিছু ১৫ টাকা মাসিক চাঁদা, যা দিয়ে বিদ্যুতের বিল মেটানো হবে, শৌচালয় মেরামতিও। সাফাইকর্মী দিচ্ছে পঞ্চায়েত। পরিবারের বাড়িগুলি ছোট, ফলে নিজেদের বাড়িতে পৃথক ভাবে শৌচাগার তৈরি করা মুশকিল হচ্ছিল। মেয়েরা আর 'মাঠ সারতে' রাজি নন। আমাদের রাজ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা তো জমি হাসিল করে চাষ করছেন, পুকুর জমা নিয়ে মাছ চাষ করছেন, তাঁরা এ রকম চাঁদা করে গণশৌচালয় তৈরি করতে পারেন না?

শৌচালয় থাকলে অনেকগুলি মেয়ে বেঁচে থাকবে, তার সঙ্গে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া, এ সব তো বাড়তি সুবিধা? যেমন স্কুলে শৌচালয় না থাকলে ইসকুল-পড়ুয়া মেয়েদের ২৩ শতাংশ ঋতুমতী হয়ে পড়া ছেড়ে দেয়, বাকিরা 'ওই' চার-পাঁচ দিন কামাই করে, বছরে দাঁড়ায় ৫০ দিন। যে মেয়েরা ইসকুল শেষ করতে পারে, বেশি পড়তে পারে, তারা অন্যায় শোষণ আর বঞ্চনার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে, অসুখবিসুখে সাবধান হতে পারে, সমাজকে দেওয়ার মতো দক্ষতা অর্জন করতে পারে, আঠারোর আগে বিয়েতে 'না' বলতে পারে, শিশুজন্মের সময় মৃত্যু হয় না, মা হলে সন্তানকে সুস্থ আর শিক্ষিত করে তুলতে পারে। নারীশিক্ষার হার ১০ শতাংশ বাড়লে দেশের উন্নয়ন বাড়ে ০.৩ শতাংশ হারে। খোলা জায়গায় মলত্যাগ দেশের শ্রমশক্তিকেও কমিয়ে দিচ্ছে— এ জন্য জলবাহিত রোগে বছরে শ্রমদিবস নষ্ট হয় ৭ কোটি, রোগ সারাতে অর্থব্যয় তো আছেই। দেশের ১৫টি শহরে সমীক্ষা করে 'স্কোয়াটিং রাইটস' রিপোর্ট (২০১২) দেখিয়েছে, আর্থিক ভাবে তুলনায় দুর্বল বসতিগুলিতেই শৌচালয় আর নিকাশি ব্যবস্থার বিশেষ অভাব, যেখানে ঘনবসতিতে থাকেন প্রধানত নিম্নবর্গ, সংখ্যালঘু মানুষ। ফল: 'অসুস্থ শিশু, অশিক্ষিত কিশোরী আর অনুৎপাদনশীল মানুষ, যা এই জনগোষ্ঠীকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে, যার ফলে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের মোট জাতীয় আয়ের ৬.৪ শতাংশ'। নতুন প্রধানমন্ত্রী তো বলেইছিলেন 'পহ্‌লে শৌচালয়, ফির দেবালয়'। উন্নয়নের খাতিরেই সেই দিকে নজর দিন না? সরকারি দফতরে, স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, হাসপাতালে, ব্যাংকে, বাজারে, শপিং মলে, সিনেমা-থিয়েটারে, যাতায়াতের পথে, বাসস্ট্যান্ডে, হোটেলে, রেস্টুরেন্টে পর্যাপ্ত শৌচালয় বানানো দরকার। যেখানে শৌচালয় আছে, সেগুলিকে ব্যবহার্য করাও তো অবিলম্বে প্রয়োজন, বিশেষত ট্রেনে আর স্টেশনে।

গণশৌচালয় আন্দোলন এ সবকে অধিকারের মধ্যে আনতে চায়। শিক্ষার মতো শৌচালয়ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। কারণ, এর সঙ্গে মেয়েদের বাঁচা-মরা জড়িয়ে।

তবু এরই মধ্যে দু'একটা রুপোলি রেখা আছে। হরিয়ানায় 'বাড়িতে শৌচালয় নেই তো বউ আসবে না' প্রচার বেশ সফল।

সম্পাদক সমীপেষু

ব্যাঙ্ক যা পেরেছে

সুপর্ণ পাঠক ('যে পথে গ্রামে পৌঁছনো যায়', ২০-৫) যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছেন তাতে মনে হতে পারে যে, এত দিন বোধহয় প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়নি এবং মাইক্রোফিনান্স সংস্থাই গ্রামীণ বিকাশের একমাত্র ভরসা। কিন্তু এ ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত, ভারতে যেটুকু গ্রামীণ বিকাশ হয়েছে তার সম্পূর্ণ দাবিদার অবশ্যই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক এবং রিজনাল রুরাল ব্যাঙ্ক। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করার অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রামীণ বিকাশ। সেই কারণেই আই আর ডি পি, ডি আর ডি এ প্রভৃতি প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করে। এর জন্য প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়। যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক শাখা খোলেনি সেখানে রিজনাল রুরাল ব্যাঙ্ক শাখা খুলে গ্রামের মানুষকে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে। এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাঙ্ক কর্মচারী এবং অফিসারেরা সাধ্যাতীত পরিশ্রম করেছেন। শুধু ছাগল নয়, গরু, মোষ, হাঁস-মুরগি, শূকর, মাছ চাষ, সেচ প্রকল্প প্রভৃতি নানাবিধ প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ঋণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সকলেই আরও বড় প্রফেশনাল হওয়ার জন্য চাকরি ছেড়ে চলে আসেননি। সরকার গ্রামের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। আর সেই রাস্তায় সরকারি ব্যাঙ্কের ফিনান্স করা বাস, অটো, ট্রেকার চলছে। এ সবই গ্রামীণ বিকাশের অঙ্গ।

ভারতের সব গ্রাম কিন্তু এখনও সুগম নয়। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে, জঙ্গলমহলের গ্রামে, সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে এখনও যাঁরা নিরলস কাজ করে চলেছেন গ্রামীণ বিকাশের জন্য, তাঁরা কিন্তু কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বা স্টেট ব্যাঙ্ক বা রিজনাল রুরাল ব্যাঙ্কের কর্মী-অফিসার।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক যে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করে, শুধু মুনাফা অর্জনই তার উদ্দেশ্য নয়। তারা কাজ করে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। গ্রামের পরিকাঠামো নির্মাণে এই সরকারি ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মাইক্রোফিনান্স সংস্থার প্রথম উদ্দেশ্যই কিন্তু মুনাফা অর্জন। এই সংস্থাগুলি সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে এবং কম সুদে (১২ থেকে ১৫ শতাংশ) ঋণ নেয়। আর গ্রামের মানুষকে ঋণ দেয় প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ সুদে।

তৃতীয়ত, ঋণের টাকা যথাসময়ে ফেরত পাওয়া। ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের টাকা যে চুক্তি অনুযায়ী ফেরত দিতে হয়, এই কথাটা ভারতের কত জন মানেন, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এ ব্যাপারে গরিব-বড়লোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম-শহর, নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে কর্পোরেট— সকলেই প্রায় একই পথের পথিক। এর সঙ্গে আছে রাজনৈতিক দল। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি কখনও ঋণ-মেলা করে ভোট কুড়িয়েছে তো কখনও ঋণ মকুবের সরকারি ঘোষণা করে ভোট আদায় করেছে। জাঁতাকলে পড়েছে সরকারি ব্যাঙ্ক ও তার কর্মী-অফিসারেরা। ভারতে ঋণ— বিশেষত গ্রামীণ ক্ষেত্রে যে সব ঋণ দেওয়া হয় অর্থাৎ যার জন্য কোনও স্থাবর সম্পত্তি সিকিয়োরিটি হিসেবে নেওয়া হয় না, সেই সব ঋণ— উদ্ধারের জন্য আজও সুনির্দিষ্ট, সুদৃঢ় আইন নেই। মাইক্রোফিনান্স সংস্থার কাছেও কিন্তু ঋণ উদ্ধারের জন্য আইনসিদ্ধ কোনও রাস্তা নেই। গ্রামের মাতব্বরদের হাতে যদি ঋণ উদ্ধারের দায়িত্ব পড়ে তবে গ্রামের ঋণ-গ্রহীতার কী ভবিষ্যৎ হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

২০০২ সালে যে SARFAESI আইন চালু হয়েছে ঋণ উদ্ধারের জন্য (স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে) তার ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রাঘব-বোয়াল। ধরা পড়ছে চুনোপুঁটি।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ এবং দেশের অর্থনীতির বিকাশ সরকারি ব্যাঙ্কের সাহায্যেই করা সম্ভব। চাই সুনির্দিষ্ট আইন এবং সরকারি সদিচ্ছা।

দুর্গাশ্রী বসু রায়। *হাওড়া-৩*

মাতৃভাষার বন্ধন

■ চন্দ্রশেখর ঘোষের 'বন্ধন ব্যাঙ্ক'-এ পাশবই, এটিএম কার্ড, চেকবই ও অন্যান্য কাজকর্ম বাংলা ভাষায় হোক। তা হলে আমার মতো গ্রাহকরা খুব উপকৃত হবে। বাংলায় কাজ হলে তা ব্যাঙ্ককে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সাহায্য করবে। অন্য রাজ্যে 'বন্ধন ব্যাঙ্ক' শাখা খুললে সেখানেও তাদের ভাষা ব্যবহৃত হতে পারে। এই ভাবে 'বন্ধন ব্যাঙ্ক' প্রত্যেক রাজ্যে তাদের ভাষায় কাজ করলে সাধারণ মানুষের খুব কাছে পৌঁছতে পারবে।

সুজনকুমার দে। *হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগনা*